বন্যা সহনশীল ফসল এবং হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ

বন্যা সহনশীল ফসল

বন্যা ঃ

সাধারণভাবে বন্যা বলতে বুঝায় অস্বাভাবিক পানির প্রবাহ, যা প্লাবনমুক্ত ভূমিকে প্লাবিত করে এবং জান ও মালের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে(আষাঢ়-শ্রাবণ) আমাদের দেশের নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। তবে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ বন্যা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বর্ষার পানি জীবন বা সম্পদের কোন ক্ষয়ক্ষতি না করে তুক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে বন্যা বলতে পারি না। যখন বর্ষার পানি জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন ব্যাহত করে তখন আমরা তাকে বন্যা বলি। অর্থাৎ বর্সা + ক্ষয়ক্ষতি = বন্যা।

বন্যার প্রকারভেদ ঃ

(ক) আকস্মিক বন্যা (Flash Flood) ঃ এ ধরনের বন্যা পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলীয় নদী এলাকায় দেখা যায়। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো হঠাৎ করে পানির উচ্চতা বেড়ে যায়। পানি প্রবাহের বেগ বেশী থাকার ফলে সম্পদ আর ফসলাদির প্রচুর ক্ষতি হয়। এ জাতীয় বন্যা এপ্রিল-মে মাসে হয়ে থাকে।

(খ) বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা (Rain Flood) ঃ বর্ষা মেসৈুমে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের ফলে এ ধরনের বন্যার সৃষ্টি হয়। কারণ স্থানীয় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অনেক সময় বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয় না। এ জাতীয় বন্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে হয়ে থাকে।

(গ) প্রধান প্রধান নদীর মৌসুমী বন্যা (Seasonal Flood of Main Rivers) ঃ বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই বিভিন্ন নদীতে পানি বাড়তে শুরু করে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা তিনটি নদীর সর্বোচ্চ সীমা মিলিত হলে বন্যা প্রকট আকার ধারণ করে। এ জাতীয় বন্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে হয়ে থাকে।

(ঘ) জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যা (Floowf due to Storm Surge) ঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক নদী মোহনা, জোয়ার প্লাবিত সমতল ভূমি ও নিম্ন দ্বীপাঞ্চল বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস জীবন ও সম্পদের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। এ জাতীয় বন্যা এপ্রিল-অক্টোবর মাসে হয়ে থাকে।

বন্যার প্রধান কারণসমূহ ঃ

- উত্তরের উজান দেশগুলো থেকে আসা প্রচুর পানি।
- অল্প সময়ে অধিক পানির চাপ।
- নদী, খাল, জলাশয়ের তলদেশ ভরাট হয়ে যায়।
- নদী পথের গতি পরিবর্তন হওয়া।
- পানি প্রবাহে/নিষ্কাশনে বাধা।
- যথোপযুক্ত বাঁধের অভাব।

- অপরিকল্পিত বাঁধ/রাস্তা নির্মাণ।
- উজানের বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়া।
- অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও দ্রুত নগরায়ন।

বন্যা সহনশীল ফসল ঃ

যে সকল ফসল বন্যার পানি সহ্য করে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখে তাকে বন্যা সহনশীল ফসল বলে। যেমন ঃ ব্রি ধান৫১, ব্রিধান৫২, বিনাধান১১, বিনাধান১২, ঈশ্বরদী-৩৩ ঈশ্বরদী-৩৪ জাতের আখ , ডি ১৫৪, ও ৯৮৯৭ পাটের জাত ইত্যাদি।

বন্যা কবলিত এলাকার জন্য ফসলের উপযোগী জাত ঃ

ফসল	জাত	বৈশিষ্ট্য
জলি আমন	বাদাল, হবিগঞ্জ-১, হবিগঞ্জ-২, হবিগঞ্জ-৪, হবিগঞ্জ-৮, ফুলকুরি, লাখি, আছমিতা, দুধলাকি, জলভাঙ্গা, লক্ষী দীঘা, মানিকদীঘা, সোনা দীঘা, হিজল দীঘা, শিশু মতি	তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে।
রোপা আমন	ব্রিধান ৪০, ব্রিধান৪১, ব্রিধান৪৬, গাঞ্জিয়া, নাইজারশাইল, মালশিরা	নাবী ও লম্বা জাত, বন্যার পানি সওে যাওয়ার পর লাগানো যেতে পারে।
বোরো	ব্রিধান ২৮, ব্রিধান২৯, ব্রিধান৪৫, ব্রিধান৫১, ব্রিধান৫২	সময়মতো লাগালে আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পাবে।
পাট পানি কচু আখ	ডি১৫৪, ও ৯৮৯৭ স্থানীয় জাত ঈশ্বরদী-৩৪ ঈশ্বরদী-৩৮ ঈশ্বরদী-৩৯	গাছ পানিতে সম্পূর্ণ না ডুবলে ক্ষতি হয় না

ধান উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

ভূমিকা ঃ

ধান আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য শস্য। তাই এর সাথে এদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ঘন বসতিপূর্ণ এ দেশের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। অপরদিকে বাড়িঘর, কলকারখানা, হাট-বাজার, সড়ক জনপথ স্থাপন এবং নদী ভাংগন ইত্যাদি কারণে আবাদি জমির পরিমান প্রতিনিয়ত কমছে। তার উপর রয়েছে খরা, বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার-ভাটা, লবণাক্ততা, শৈত্য প্রবাহ ও শিলাবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে স্বল্প খরচে বেশি ধান উৎপাদন করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য।

বাংলাদেশ পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ হলেও এদেশের ধানের গড় ফলন বিঘা প্রতি ৫৪১.১৬ কেজি। চীন, জাপান ও কোরিয়ায় এ ফলন ৭৪২.২৪ কেজি। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার সাথে সংগতি রেখে ধানের ফলন বাড়ানো ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সনাতন জাতের ধান এবং মান্ধাতার আমলের আবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব। এজন্য প্রয়োজন উচ্চ ফলনশীল (উফসী) ধান ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচলন।

ধান চাষের গুরুত্ব ঃ

- ভাত আমাদের প্রধান খাবার, যা ধান হতে আসে।
- আমাদের আবহাওয়া, মৌসুম ও জমি ধান চাষের উপযোগী।
- ধান সহজে ফলানো যায়।
- একই জমিতে বছরে ২-৩ বার ধান চাষ করা যায়।
- কৃষকরা সহজে ধান সংরক্ষণ করতে পারেন।

কাংখিত ফলনের উপায় সমূহ ঃ

(১) উচ্চ ফলনশীল জাত নির্বাচন
(২) ভাল মানের বীজ ব্যবহার
(৩) বীজতলা তৈরী ও বীজ বপন
(৪) ভালভাবে জমি তৈরী ও চারা রোপণ
(৫) যথাসময়ে আগাছা দমন
(৬) সুষম সার ব্যবহার
(৭) সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা
(৮) পোকামাকড় ও রোগবালই দমন
(৯) সঠিক সময়ে ধান কাটা ও মাড়াই
(১০) ধান শুকানো, গুদামজাতকরণ

উল্লেখযোগ্য আধুনিক জাতসমূহ ঃ

ক্র. নং	জাত	মৌসুম	জীবনকাল (দিন)
১	বিআর৩	আমন	১৪৫
২	বিআর৪	আমন	১৪৫
৩	বিআর৫	আমন	১৫০
৪	বিআর১০	আমন	১৫০
৫	বিআর১১	আমন	১৪৫
৬	বিআর২২	আমন	১৫০
৭	বিআর২৩	আমন	১৫০

৮	বিআর২৫	আমন	১৩৫
৯	ব্রিধান৩০	আমন	১৪৫
১০	ব্রিধান৩১	আমন	১৪০
১১	ব্রিধান৩২	আমন	১৩০
১২	ব্রিধান৩৩	আমন	১১৮
১৩	ব্রিধান৩৪	আমন	১৩৫
১৪	ব্রিধান৩৭	আমন	১৪০
১৫	ব্রিধান৩৮	আমন	১৪০
১৬	ব্রিধান৩৯	আমন	১২২
১৭	ব্রিধান৪০	আমন	১৪৫
১৮	ব্রিধান৪১	আমন	১৪৮
১৯	ব্রিধান৪৪	আমন	১৪৫
২০	ব্রিধান৪৬	আমন	১২৪
২১	ব্রিধান৪৯	আমন	১৩৫
২২	ব্রিধান৫১	রোপা আমন	১৪২
২৩	ব্রিধান৫২	রোপা আমন	১৪৫
২৪	ব্রি হাইব্রিড ধান৪	আমন	১১৮

স্থানীয় জাতসমূহ ঃ

মেটে গরল, শড়শড়ি, দিঘা ইত্যাদি।

বীজ বুনার সময় ঃ

উপযুক্ত সময় আগষ্টের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত
নাবী ঃ সেপ্টেম্বর ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত

সার প্রয়োগ (কেজি/বিঘা) ঃ

সার	পরিমাণ
ইউরিয়া	১১ কেজি
টিএসপি	১৮ কেজি
এমপি	৯ কেজি
জিপসাম	৭ কেজি
জিংক	১ কেজি

আগাছা ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

বুনার পর কমপক্ষে ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ আগাছা-

(১)শ্যামা (২) ক্ষুদে শ্যামা (৩) গৈচা (৪) হলদে মুথা (৫) বড় চুঁচা (৬) বড় জাভানী (৭) চেঢ়ড়া (৮) পানি কচু (৯) পানি লং (১০) ঝিল মরিচ (১১) কানাইনালা (১২) কেশুটি

দমন ব্যবস্থা-

- সারিতে রোপণ।
- হাত দিয়ে বাছাই।
- উইডার দিয়ে বাছাই।
- হাঁস চাষে দমন।
- আগাছানাশক ব্যবহার।
- জমির আইল ও সেচনালা আগাছা মুক্ত রাখুন।
- জমির আশেপাশে পরিষ্কার রাখুন।

লিফ কালার চার্ট (এলসিসি)

লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) কি?

লিফ কালার চার্ট বা এলসিসি হলো প্লাষ্টিকের তৈরী চার রং বিশিষ্ট একটি স্কেল।

লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) এর সুবিধা ঃ

- এলসিসি ব্যবহারে শতকরা ২০-২৫ ভাগ ইউরিয়া সাশ্রয় করা যায়
- ইউরিয়া সারের খরচ কমানো যায়
- ইউরিয়া সারের অপচয় রোধ করা যায়
- সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়
- এলসিসি ব্যবহারে প্রতি বিঘায় বোরো মৌসুমে ৪৫ কেজি ফলন বাড়ে অথচ বোরোতে ৯ কেজি ইউরিয়া কম লাগে।

লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) ব্যবহারের নিয়ম ঃ

- বোরোতে চারা রোপণের ২১ দিন পর থেকে থোর অবস্থা পর্যন্ত ১০ দিন পর পর এলসিসি দিয়ে পাতার রং মাপুন ও প্রয়োজনে সার দিন। মান পরিমাপের পর সার দেয়ার প্রয়োজন না হলে ৫ দিন পর পর পুনরায় মাপুন।
- প্রতিবার মাপ নিতে জমির বিভিন্ন জায়গা থেকে ১০টি সুস্থ সবল গাছ/গোছা বেছে নিন।
- শরীরের ছায়ায় বেছে নেয়া গোছার সর্বোচ্চ পাতার মাঝের অংশের সাথে এলসিসির রং মেলান। এলসিসির যে মানের রংয়ের সাথে পাতার রং মিলবে সেটিই পাতার এলসিসির মান।
- ৬টি বা তার বেশি এলসিসি মান ৩.৫ বা এর কম হলে বোরোতে বিঘা প্রতি ৯.০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- সকাল ৯-১১ টা ও বিকাল ২-৪ টার মধ্যে এলসিসি মান নির্ণয় করা যায়।

সার কি ?

উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য এক বা একাধিক পুষ্টি উপাদান সরবরাহের জন্য মৃত্তিকাতে যে সকল প্রাকৃতিক দ্রব্য বা কল-কারখানায় প্রস্তুত অজৈব বা জৈব দ্রব্য জমিতে প্রয়োগ করা হয় তাকে সার বলে।

সারের প্রকারভেদ ঃ

(ক) জৈব সার ঃ খামার জাত সার, কম্পোষ্ট, সবুজ সার ইত্যাদি (প্রাকৃতিক বর্জ্য থেকে উৎপাদিত)। ইহা প্রাকৃতিক সার।

(খ) অজৈব বা রাসায়নিক সার ঃ ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিংক, দস্তা ইত্যাদি (কল-কারখানায় প্রস্তুত)। ইহা কৃত্রিম সার।

সারের অভাবজনিত লক্ষণ ও তার প্রতিকার ঃ

ক্র. নং	সার	অভাবজনিত লক্ষণ	প্রতিকার
১	নাইট্রোজেন	(১) নীচের চিকন ও খাটো পাতা হলদে সবুজ হয়। (২) গাছের বৃদ্ধি কম হয়। (৩) কুশির সংখ্যা কম হয়। (৪) সারা ক্ষেত হলুদ হয়।	বিঘা প্রতি জাতভেদে ২৯-৪০ কেজি ইউরিয়া সার ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করুন।
২	ফসফরাস	(১) খাটো, সরু, খাড়া, বিকৃত সবুজ পাতা হয়। (২) গাছ খাট হয়। (৩) কুশি কম হয়। (৪) জমির মাঝে মাঝে ধান গাছ বসে যাওয়ার মতো হয়।	বিঘা প্রতি জাতভেদে ৭-১৪ কেজি ফসফরাস সার প্রয়োগ করুন।
৩	পটাশিয়াম	(১) পাতার আগা ও কিনারা মরে যাওয়ার মতো হয়। (২) গাছ খাট হয়। (৩) গাছের সজীবতা হারিয়ে ফেলায়।	বিঘা প্রতি জাতভেদে ৮-১৬ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করুন।
৪	গন্ধক/সালফার	(১) নতুন পাতা শিরাসহ হলুদ হয়। (২) ক্রমান্বয়ে সারা গাছের পাতা হলুদ হয়। (৩) জমিতে উপরের অংশ হলুদ হয়।	বিঘা প্রতি জাতভেদে ৮-১০ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করুন।
৫	জিংক/দস্তা	(১) নতুন পাতা হলুদাভ কিন্তু শিরা সবুজ হয়। (২) পুরাতন পাতায় বাদামী দাগ দেখা যায়।	বিঘা প্রতি জাতভেদে ১.৫-২.০ কেজি দস্তা সার প্রয়োগ

		(৩) কুশির সংখ্যা কম হয়।	করুন।

জৈব সার কি ? ঃ

উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর গলিত ও পচনশীল দেহাবশেষ, জীবজন্তুও মলমূত্র প্রভৃতি মাটিতে পচে যে সারের সৃষ্টি হয় তাকে জৈব সার বলে। সারের রাজা জৈব সার।

জৈব সার এর প্রকারভেদ ঃ

খামারজাত সার, কম্পোষ্ট, শুষ্ক রক্ত, হাড়ের গুঁড়া, সবুজ সার ইত্যাদি।

জৈব সার এর গুরুত্ব ঃ

- মৃত্তিকা বুনটের উন্নত করে
- মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- মাটির বাফার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রন করে
- মাটিতে বায়ু চলাচলে সুবিধা হয়
- আবদ্ধকৃত ফসফরাস মুক্ত করতে সাহায্য করে
- ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও কেচোর সংখ্যা বাড়ায়
- মাটির গঠন বিন্যাসের উন্নয়ন ঘাঁয়

জৈব সার তৈরীর পদ্ধতি ঃ

■ ১২৫ সেমি × ১২৫ সেমি × ১২৫ সেমি আকারের ২টি গর্ত পাশাপাশি করে উপরে চালা দিয়ে চারদিকে আইল বেঁধে দিন।
■ গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্টা, গৃহস্থালির উচ্ছিষ্ঠাংশ, ফসলের অংশবিশেষ, আবর্জনা নিয়মিত গর্তে ফেলুন।
■ জমানোর ১ মাস পর পর আবর্জনাগুলোকে উলট পালট করুন।
■ কমপক্ষে ৩ মাস পর জমিতে ১০০০-১৩০০ কেজি প্রতি বিঘায় প্রয়োগ করুন।

ধানের প্রধান অনিষ্টকারী পোকামাকড় ও তাদের দমন ব্যবস্থা ঃ

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও চাষাবাদ পদ্ধতির ধরন ধানের পোকামাকড় বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৭৫ প্রজাতির ক্ষতিকর পোকা সনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২০ থেতে ৩৩ টি প্রজাতিকে প্রধান অনিষ্টকারী পোকা হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রধান ক্ষতিকর পোকার আক্রমণের জন্য বোরো, আউশ এবং রোপা আমন মৌসুমে যথাক্রমে শতকরা প্রায় ১৩, ২৪ এবং ১৮ ভাগ ফলন নষ্ট হয়। নিম্নে প্রধান কয়েকটি ক্ষতিকর পোকা ও তাদের দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

(১) মাজরা পোকা (Stem borer) ঃ

ক্ষতির ধরন ঃ

মাজরা পোকার কীড়াগুলো কান্ডের ভেতরে থেকে খাওয়া শুরু করে এবং ধীরে ধীরে গাছের ডিগ পাতার গোড়া খেয়ে কেটে ফেলে। পরে ডিগ পাতা মারা যায়। একে 'মরা ডিগ' বা 'ডেড হার্ট'বলে। মরা ডিগ টান দিলেই সহজে উঠে আসে। আক্রান্ত গাছের কান্ডে খাওয়ার দরুন ছিদ্র এবং খাওয়ার জায়গায় পোকার মল দেখতে পাওয়া যায়। গাছে থোড় হওয়ার পর বা শীষ আসার সময় ডিগ কাটলে শীষ মারা যায় বলে একে মরা শীষ বলে। মরা শীষ এর ধান চিটা হয় এবং শীষটা সাদা হয়ে যায়।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) ডিমের গাদা ও মথ সংগ্রহ করে নষ্ট করুন।
(খ) জমিতে ডালপালা পুঁতে পোকা খেকো পাখির সাহায্যে পোকা দমন করুন।
(গ) আলোক ফাঁদের সাহায্যে মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।
(ঘ) নাড়া পুড়িয়ে ফেলে মাজরা পোকার ৮০% কীড়া ও পুত্তলী নষ্ট করা যায়।
(ঙ) সহনশীল জাত (বিআর১, বিআর১০, বিআর১১, বিআর২২) চাষ করুন।
(চ) পরজীবী পোকা সংরক্ষণ করুন কারণ পরজীবী পোকা ৫০%-৬০% পোকার ডিম নষ্ট করে।
(ছ) উপরের পদ্ধতিতে দমন সম্ভব না হলে পরিমিত ও শুধুমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক সতর্কতার সংগে ব্যবহার করুন। যেমন ঃ

কীটনাশকের সাধারণ নাম	প্রয়োগমাত্রা (বিঘা প্রতি)
ডায়াজিনন (৬০ তরল)	০.২২ লিটার
ডায়াজিনন (১৪ দানাদার)	১.৮২ কেজি
ডায়াজিনন (১০ দানাদার)	২.২৬ কেজি
কার্বোফুরান(৩ দানাদার)	২.২৬ কেজি
কার্বোফুরান(৫ দানাদার)	১.৩৪ কেজি

(২) পামরি পোকা (Rice hispa) ঃ

ক্ষতির ধরন ঃ

কীড়া পাতার দুই পর্দার মধ্যে সুড়ংগ করে সবুজ অংশ কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। অনেকগুলো কীড়া খাওয়ার ফলে পাতা শুকিয়ে যায়।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) হাত জাল বা মশারির কাপড় দিয়ে পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরে মেরে ফেলুন। সকালবেলা পোকা ধরা উত্তম।
(খ) কুশি অবস্থার আগে পাতায় ডিম বা ২/৩টি কীড়া থাকলে পাতার গোড়ার ৩-৪সেমি উপর থেকে কেটে পামরী পোকা দমন করুন।
(গ) পোকা প্রতিরোধী জাত যেমন ঃ বিআর১৪ (বোরো), বিআর২৫ (আমন) ধানের চাষ করুন।
(ঘ) শতকরা ২৫ ভাগ পাতা আক্রান্ত হলে পরিমিত ও শুধুমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক সতর্কতার সংগে ব্যবহার করুন।

যেমন ঃ

কীটনাশকের সাধারণ নাম	প্রয়োগমাত্রা (বিঘা প্রতি)
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	০.১৩ লিটার
ডায়াজিনন (৬০ তরল)	০.১৩ লিটার

(৩) বাদামী গাছ ফড়িং (Brown Plant Hopper) ঃ

ক্ষতির ধরন ঃ

বাচ্চা এবং পোকা ধানগাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খাওয়ার ফলে হপার বার্ণ বা ফড়িং পোড়া বা বাজ পোড়ার সৃষ্টি হয়। কাই থোড় অবস্থায় বেশী ক্ষতি করে।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) জমিতে পোকা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমি থেকে পানি সরিয়ে ফেলুন।
(খ) ধানের চারা একটু বেশী দূরত্ব (৩০ সেমি × ৩০ সেমি) বজায় রেখে সারিতে লাগান।
(গ) সহনশীল জাত (বিনা ধান৫, বিনা ধান৬, ব্রি ধান৩৫) চাষ করুন।
(ঘ) ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
(ঙ) আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।
(চ) ক্ষেতের অধিকাংশ গাছে ২-৪টি ডিমওয়ালা স্ত্রী পোকা বা ১০টি বাচ্চা পোকা প্রতি গোছায় পাওয়া গেলে পরিমিত ও শুধুমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক সতর্কতার সংগে ব্যবহার করুন। যেমন ঃ

কীটনাশকের সাধারণ নাম	প্রয়োগমাত্রা (বিঘা প্রতি)
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	০.১৩ লিটার
ডায়াজিনন (৬০ তরল)	০.১৩ লিটার
ডায়াজিনন (১০ দানাদার)	২.২৬ কেজি

কার্বোফুরান (৫ দানাদার)	১.৩৪ কেজি
কার্বোফুরান (৩ দানাদার)	২.২৬ কেজি

(৪) সবুজ পাতাফড়িং (Green Leafhopper) ঃ

ক্ষতির ধরন ঃ

বাচ্চা এবং পোকা ধানের পাতার রস শুষে খায় এবং টুংরো রোগ ছড়ায়।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) আলোক ফাঁদের সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।
(খ) হাত জাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন।
(গ) জমিতে ডাল পুঁতে পোকাখেকো পাখির সাহায্যে দমন করুন।
(ঘ) প্রয়োজনে পরিমিত ও শুধুমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক সতর্কতার সংগে ব্যবহার করুন। যেমন ঃ

কীটনাশকের সাধারণ নাম	প্রয়োগমাত্রা (বিঘা প্রতি)
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	০.১৩ লিটার
কার্বারিল (৮৫ পাউডার)	০.২২ কেজি

(৫) গান্ধি পোকা (Rice bug) ঃ

ক্ষতির ধরন ঃ

ধান গাছের দানা থেকে রস শুষে খায় ফলে ধান চিটা হয়।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।
(খ) প্রয়োজনে পরিমিত ও শুধুমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক সতর্কতার সংগে ব্যবহার করুন। যেমন ঃ

কীটনাশকের সাধারণ নাম	প্রয়োগমাত্রা (বিঘা প্রতি)
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	০.১৪ লিটার

(৬) শীষকাটা লেদা পোকা (Ear-cutting caterpillar)/আর্মি ওয়ার্ম (Army worm) ঃ

ক্ষতির ধরন ঃ

কীড়াগুলো প্রাথমিক অবস্থায় পাতার পাশ থেকে কেটে খায়। কীড়াগুলো বড় হলে আধা পাকা বা পাকা ধানের শীষের গোড়া কেটে দেয়। এরা এক ক্ষেত খেয়ে আর এক ক্ষেত আক্রমণ করে।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) ধানের খড় ও নাড়া জমিতে পুড়িয়ে পোকার কীড়া ও পুত্তলী নষ্ট করা যায়।
(খ) বাঁশ দিয়ে পরিপক্ক ধান হেলিয়ে বা শুইয়ে দিয়ে পোকা দমন করুন।
(গ) ক্ষেতের চারপাশে নালা করে সেখানে কেরোসিন মিশ্রিত পানি দিয়ে পোকা দমন করুন।
(ঘ) জমিতে পানি দিয়ে দমন করুন।
(ঙ) জমিতে ডাল পুঁতে পোকাখেকো পাখির সাহায্যে দমন করুন।
(চ) প্রয়োজনে পরিমিত ও শুধুমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক সতর্কতার সংগে ব্যবহার করুন। যেমন ঃ

কীটনাশকের সাধারণ নাম	প্রয়োগমাত্রা (বিঘা প্রতি)
কারবারিল (৮৫ পাউডার)	০.২২ কেজি

(৭) পাতা মোড়ানো পোকা (Leaf folder/roller)

ক্ষতির ধরন ঃ

কীড়াগুলো পাতার সবুজ অংশ খায় এবং বড় হবার সাথে সাথে তারা পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে একটা নলের মতো করে ফেলে।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।
(খ) জমিতে ডাল পুঁতে পোকাখেকো পাখির সাহায্যে দমন করুন।
(গ) প্রয়োজনে পরিমিত ও শুধুমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক সতর্কতার সংগে ব্যবহার করুন। যেমন ঃ

কীটনাশকের সাধারণ নাম	প্রয়োগমাত্রা (বিঘা প্রতি)

ম্যালাথিয় (৫৭ তরল)	০.১৩ লিটার
ডায়াজিনন (১০ দানাদার)	২.২৬ কেজি

(৮) গল মাছি বা নলি মাছি (Gall midge) ঃ

ক্ষতির ধরন ঃ

কীড়া ধান গাছের মাঝখানের পাতা আক্রমণ করে এবং ঐ পাতা পেঁয়াজ পাতার মতো হয়ে যায়। ফলে কুশিতে আর শিষ বের হয় না।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।
(খ) প্রয়োজনে পরিমিত ও শুধুমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক সতর্কতার সংগে ব্যবহার করুন। যেমন ঃ

কীটনাশকের সাধারণ নাম	প্রয়োগমাত্রা (বিঘা প্রতি)
ফুরাডান (৫ দানাদার)	১.৩৪ কেজি
বাসুডিন (১০ দানাদার)	২.২৬ কেজি
ডায়াজিনন (৬০ তরল)	০.২২ লিটার

(৯) চুংগী পোকা (Case worm) ঃ

ক্ষতির ধরন ঃ

কীড়া বড় হলে পাতার ওপরের অংশ কেটে ছোট ছোট চুংগী তৈরী করে ভেতরে থাকে। ধান গাছের কুশি ছাড়ার শেষ অবস্থা আসার আগে কীড়াগুলো পাতার সবুজ অংশ লম্বালম্বিভাবে এমন করে কুরে কুরে খায় যে শুধুমাত্র উপরের পর্দাটা বাকী থাকে। আক্রান্ত ক্ষেতের গাছের পাতা সাদা দেখা যায়। চারা অবস্থায় এ পোকা বেশী ক্ষতি করে।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) জমির পানি সরিয়ে দিয়ে ১-২ দিন মাটি শুকিয়ে নিন।
(খ) আলোক ফাঁদের সাহায্যে মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন।
(গ) একটি রশি জমির উপর টেনে নিলে কীড়াসহ চুংগীগুলো জমির পানিতে পড়ে যায়। এ অবস্থায় পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে পোকা দমন করুন।

(ঘ) কুড়ার সাথে ১.৫ লিটার কেরোসিন মিশিয়ে ০.৫ বিঘা জমিতে ছিটিয়ে পোকা দমন করুন।
(ঙ) জমিতে ২৫% এর বেশী পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে পরিমিত ও শুধুমাত্র অনুমোদিত কীটনাশক সতর্কতার সংগে ব্যবহার করুন। যেমন ঃ

কীটনাশকের সাধারণ নাম	প্রয়োগমাত্রা (বিঘা প্রতি)
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	০.১৩ লিটার
ডায়াজিনন (১০ দানাদার)	২.২৬ কেজি

(১০) ইঁদুর (Rat) ঃ

দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

(ক) জমির চারপাশের আইল চিকন ও পরিষ্কার রাখুন এতে ইঁদুরের উপদ্রব কম হয়।
(খ) ইঁদুরের গর্তে পানি বা মরিচের ধোঁয়া দিয়ে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলুন।
(গ) বিভিন্ন ফাঁদ (জীবন্ত ফাঁদ, বিস্কুটের টিনের তৈরী ফাঁদ, কাকতাড়ুয়া) ব্যবহার করে ইঁদুর মেরে ফেলুন।
(ঘ) বিভিন্ন ইঁদুরনাশক যেমন ঃ বিষটোপ, গ্যাস বড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করুন।
(ঙ) সাপ, বেজি, পেঁচা, চিল ইত্যাদি সংরক্ষণের মাধ্যমে ইঁদুরের আক্রমণ কমানো যায়।

এসব পোকা দমনে কীটনাশকের ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করাই শ্রেয়। ক্ষেতে উপস্থিত উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা দেখে যদি প্রতীয়মান হয় যে তারা ক্ষতিকারক পোকামাকড়কে আর্থিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্তের নিচে রাখতে সম্ভব তাহলে কীটনাশক প্রয়োগ না করাই ভালো। উপকারী পোকামাকড় দ্বারা দমন না হলে এবং আংশিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্ত অতিক্রম করে গেলে শুধু তখনই জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত। কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে তা করতে হবে-

(ক) কীটনাশক নির্বাচন সঠিক হতে হবে
(খ) সঠিক মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে
(গ) পানির পরিমাণ সঠিক হতে হবে
(ঘ) যথাযথ স্প্রে-মেশিনের সাহায্যে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে
(ঙ) উপযুক্ত সময়ে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে

ফসলের উপকারী পোকামাকড়ের পরিচিতি ঃ

উপকারী পোকার বৈশিষ্ট্য ঃ

- এরা অন্য ক্ষতিকর নপোকা খায়

- এরা ক্ষতিকর পোকার ডিম, শূকশীট, মূকশীট ক্ষতিগ্রস্ত করে
- এরা সরাসরি অন্য পোকা শীকার করে
- এরা ক্ষতিকর পোকা আক্রমণ করে তাদের বিনষ্ট করে
- এরা পরিবেশ রক্ষা করে
- এরা জীববৈচিত্র্য ও জৈবিক পরিবেশ রক্ষা করে

উপকারী পোকার ধরণ ঃ

(১) পরভোজী পোকা ঃ মাকড়সা, লেডি বার্ড বিটল, ঘাস ফড়িং ইত্যাদি।
(২) পরজীবি পোকা ঃ মশা, হর্স ফ্লাই, মৌমাছি, হাউজ ফ্লাই ইত্যাদি।
(৩) রোগজীবাণু ঃ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি।

উপকারী পোকামাকড় ও প্রাণী ঃ

লেডী বার্ড বিটল, গ্রাউন্ড বিটল, উরচুংগা, ঘাসফড়িং, ওয়াটারবাগ, প্লান্ট বাগ, ড্যামজেল ফ্লাই, ইয়ারউইগ, নেকড়ে মাকড়সা, জাম্পিং মাকড়সা, টেলিনোমাস বোলতা, টেরোম্যালিড বোলতা, পিঁপড়া, ছত্রাক আক্রান্ত পোকা, ভাইরাস আক্রান্ত কীড়া, ব্যাঙ। এছাড়া চিল, পেঁচা, গুইসাপ ইত্যাদি উপকারী প্রাণী। এরা অনিষ্টকারী পোকা খেয়ে পরিবেশের উপকার করে থাকে। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরী।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ঃ

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কি ?

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলতে পরিবেশকে দুষন মুক্ত রেখে এক বা একাধিক ব্যবস্থাপনা (জৈবিক দমন, বালাই সহনশীল জাতের চাষ, আধনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার, যান্ত্রিক দমন ও পরিশেষে রাসায়নিক দমন) গ্রহণের মাধ্যমে ফসলের ক্ষতিকারক পোকা ও রোগ বালাইকে অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমার নিচে রাখাকে বুঝায়।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার সুবিধা ঃ

- পরিবেশকে দুষণমুক্ত রাখে
- পরিবেশের জৈবিক ভারসাম্য বজায় রাখে
- উপকারী পোকামাকড়, ব্যাঙ ও মাছ সংরক্ষণ করে
- কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে দেয়
- কম খরচে ফসল সংরক্ষণে সাহায্য করে
- খাদ্য দ্রব্যকে কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্ত রাখে

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মূলনীতি ঃ

- সুস্থ্য সবল ফসল উৎপাদন
- উপকারী পোকামাকড় সংরক্ষণ
- নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন

▪ কৃষককে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলা

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) এর বিভিন্ন উপাদান ঃ

(ক) উপকারী পোকামাকড় সংরক্ষণ-

বিভিন্ন প্রকার উপকারী পোকা। যেমন-লেডী বিটল, গ্রাউন্ড বিটল, উরচুংগা, ঘাসফড়িং, ওয়াটারবাগ, প্লান্ট বাগ, ড্যামজেল ফ্লাই, ইয়ারউইগ, নেকড়ে মাকড়সা, জাম্পিং মাকড়সা, টেলিনোমাস বোলতা, টেরোম্যালিড বোলতা, পিঁপড়া, ছত্রাক আক্রান্ত পোকা, ভাইরাস আক্রান্ত কীড়া, ব্যাঙ, চিল, পেঁচা, গুইসাপ ইত্যাদি।

(খ) বালাই সহনশীল জাতের চাষ-

যেমন- বিআর১৪, ব্রিধান২৭, ব্রিধান৩১, ব্রিধান৩৯ ইত্যাদি।

(গ) আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি-

এলসিসি ব্যবহার, সারিতে চারা রোপণ, ভাল বীজ ব্যবহার, আগাছামুক্ত জমি, সুষম সার ব্যবহার ইত্যাদি।

(ঘ) যান্ত্রিক দমন ব্যবস্থাপনা-

ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার, আলোক ফাঁদ ব্যবহার, হাত জাল ব্যবহার, ক্ষেতে ডাল পুঁতে রাখা ইত্যাদি।

(ঙ) বালাইনাশক ব্যবহার

ধানের রোগসমূহ ও তাদের দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

পাতাপোড়া রোগ, ক্রিসেক রোগ, খোলপোড়া রোগ, ব্লাস্ট রোগ, বাকানী রোগ, খোলপঁচা রোগ, কান্ডপঁচা রোগ, বাদামী দাগ রোগ, পাতা ফোস্কা রোগ, লক্ষীর গু রোগ, টুংরো রোগ, উফরা রোগ ইত্যাদি।

পাতাপোড়া রোগ (Bacterial Leaf Blight)

লক্ষণ

চারা অবস্থায় এ রোগ হলে সম্পূর্ণ গোছা পচে যায় (যাকে কৃসেক বলে)। প্রথমে পাতার অগ্রভাগ থেকে কিনারা বরাবর পোড়া লক্ষণ দেখা দেয়। পরে পাতাটা শুকনো খড়ের রং ধারণ করে এবং ক্রমশ সম্পূণ পাতাটাই মরে শুকিয়ে যায়।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) চারা উঠানোর সময় শিকড় যেন কম ছিড়ে তা খেয়াল করুন।
(খ) রোগ প্রতিরোধী জাতের (বোরোতে বিআর১৯ ও ব্রিধান৫০) চাষ করুন।
(গ) ঝড়ো বৃষ্টির পর ইউরিয়া সার দিবেন না।
(ঘ) রোগ দেখা গেলে ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ বন্ধ করুন।

(ঙ) ক্রিসেক হলে জমি শুকিয়ে ৭-১০ দিন পর সেচ দিন। সেই সাথে বিঘাপ্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার ছিটিয়ে দিন।
(চ) রোগাক্রান্ত জমির নাড়া ও খড় পুড়িয়ে ফেলুন।

খোলপোড়া রোগ (Sheath Blight)

লক্ষণ

প্রথমে খোলে ধূসর রঙের জলছাপের মতো দাগ পড়ে এবং তা আস্তে আস্তে বড় হয়ে সমস্ত খোলে ও পাতায় অনেকটা গোখরা সাপের চামড়ার মতো চক্কর দেখা যায়।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে পানির উপরে ময়লার আস্তরণ সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
(খ) রোগ সহনশীল ধানের জাত (বিআর২২, ব্রিধান৩২, ব্রিধান৪১, ব্রিধান৪৮, ব্রিধান৪৯) চাষ করুন।
(গ) উপযুক্ত দূরত্ব (২০ সেমি × ২০ সেমি) বজায় রেখে চারা রোপণ করুন।
(ঘ) জমিতে সেচ প্রদানের জন্য পর্যায়ক্রমে পানি দেয়া ও শুকানো (AWD) পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
(ঙ) রোগাক্রান্ত জমির ধান কাটার পর নাড়া জমিতে পুড়িয়ে ফেলুন।

ব্লাষ্ট রোগ (Blast)

লক্ষণ

এ রোগ পাতায় হলে পাতা ব্লাষ্ট, গীটে হলে গিট ব্লাষ্ট ও শীষে হলে শীষ ব্লাষ্ট বলা হয়। পাতা ব্লাষ্ট পাতায় ছোট ছোট ডিম্বাকৃতির দাগ সৃষ্টি করে। আস্তে আস্তে দাগ বড় হয়ে দু'প্রান্ত লম্বা হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে। দাগের চার ধারে বাদামী ও মাঝের অংশ সাদা-ছাই বর্ণ। অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে গিয়ে পুরো পাতা মওে যায়। এ রোগের কারণে জমির সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গিট ব্লাষ্ট এবং শীষ ব্লাষ্ট হলে গিট ও শীষ ভেঙগে পড়ে এবং ধান চিটা হয়ে যায়।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করুন, সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন ও জমিতে সব সময় পানি রাখুন।
(খ) ব্লাষ্ট প্রতিরোধী জাতের ধান (বিআর১৪, বিআর১৬, বিআর২৫, ব্রিধান২৮, ব্রিধান৩৩, ব্রিধান৪৪, ব্রিধান৪৫) চাষ করুন।
(গ) আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ বন্ধ করুন।
(ঘ) কুশি অবস্থায় রোগ দেখা দিলে পটাশ সার (৫ কেজি/বিঘা) উপরি প্রয়োগ করে সেচ দিন।
(ঙ) নির্ধারতি মাত্রায় হিনোসান, হোমাই বা টপসিন-এম এর যে কোন একটি ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করুন।

টুংরো রোগ (Tungra)

লক্ষণ

এটি সবুজ পাতাফড়িং দ্বারা সঙক্রমিত হয়। কচি পাতায় লম্বালম্বি শিরা বরাবর পর্যায়ক্রমে হালকা সবুজ ও হালকা হলদে রেখা দেখা যায়। পরে সমস্ত পাতার উপর দিক গাঢ হলদে রঙের হয় এবং আক্রান্ত পাতা একটু মুচড়ে যায়। গাছের বাড়-বাড়তি ও কুশি কমে যায়। ফলে আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছের তুলনায় খাটো হয়।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) রোগাক্রান্ত জমির আশেপাশে বীজতলা তৈরীতে বিরত থাকুন এবং বীজতলায় বাহক পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন।
(খ) প্রাখমিক অবস্থায় রোগের লক্ষণযুক্ত গাছ দেখামাত্র তা তুলে মাটিতে পুঁতে ফেলুন।
(গ) চারা রোপণের পর থেকে কুশি বৃদ্ধির শেষ পর্যন্ত জমিতে বাহক পোকা দেখামাত্র সকল চাষী মিলে দমন করুন।
(ঘ) আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে বাহক পোকা মেরে ফেলুন।
(ঙ) হাত জালের প্রতি টানে এশটি বাহক পোকা দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

উফরা রোগ (Ufra)

লক্ষণ

ধান গাছের কচি পাতা ও খোলের সংযোস্থলে আক্রমণ করে। কৃমি গাছের রস শোষণ করায় প্রখমে পাতার গোড়ায় ছিটে-ফোঁটা সাদা দাগ দেখা যায়। ক্রমান্বয়ে সে দাগ বাদামী রঙের হয়ে পুরো আগাটাই শুকিয়ে মরে যায়। আক্রমণের প্রকোপ বেশী হলে গাছের বাড়-বাড়তি কম হয়। থোড় অবস্থায় আক্রমণ করলে থোড়ের মধ্যে শিষ মোচড়ানো অবস্থায় থেকে যায়। ফলে শীষ বের হতে পারে না।

দমন পদ্ধতি ঃ

(ক) সম্ভব হলে বছরের প্রথম বৃষ্টির পর চাষ দিয়ে জমি ১৫-২০ দিন শুকান।
(খ) পূর্ববর্তী ফসল এ রোগে আক্রান্ত হলে জমি তৈরীর শেষ চাষের পূর্বে এবং কুশি পর্যায়ে রোগ দেখা দিলে জমিতে ফুরাডান ৫জি বা কুরাটার ৫জি (২.৫-৩.০ কেজি/বিঘা) প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
(গ) রোগাক্রান্ত জমির নাড়া ও খড় জমিতেই পুড়িয়ে ফেলুন।
(ঘ) রোগাক্রান্ত জমির খড় গরুকে খাওয়ানোর জন্য পালা না দিয়ে বরং জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা ভাল।
(ঙ) জমিতে ধান ছাড়াও অন্য ফসল চাষ করুন।

বীজ কি?

উদ্ভিদতাত্বিকভাবে নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বানুকে বীজ বলে। আবার কৃষিতাত্বিকভাবে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের যে অংশ অনুরূপ উদ্ভিদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহাকে বীজ বলে।

ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- রোগ ও পোকামাকড়মুক্ত
- আগাছা বীজ মুক্ত

- বিজাত মুক্ত
- অপদ্রব্য মুক্ত
- পরিপক্ক
- সম আকার বিশিষ্ট
- পুষ্ট ও উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট
- সুস্থ্য, সবল ও উচ্চ ফলনশীল
- সঠিক আর্দ্রতাযুক্ত
- অংকুরোদগম হার কমপক্ষে ৮০% এবং বিশুদ্ধার হার কমপক্ষে ৯০%

ধান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ ঃ

খাবারের জন্য সংরক্ষিত ধান ও বীজধান সংরক্ষণ পুরোপুরি আলাদা। বীজধান উৎপাদনের জন্য সাধারণত ভিত্তিবীজ বা প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করতে হয়।
(ক) সুস্থ বীজ বাছাই-

দাগযুক্ত বীজ, অন্য জাতের বীজ, অপুষ্ট বীজ, ময়লা, মাটি ও খড়-কুটা, বিকলাংগ বীজ, অন্য ফসলের বীজ, পোকা খাওয়া বীজ, সুস্থ বীজ

(খ) পানির সাহায্যে বীজ বাছাই-
বাছাইপূর্বক বীজ, চারিতে পানি, লবণ গোলা, ডিম ভাসানো, চিটা ভাসা, চিটা তোলা, তলানীতে সুস্থ বীজ, পরিস্কার পানিতে বীজ ধোয়া

(গ) বীজ গজানোর ক্ষমতা ও চারা মূল্যায়ন-

বীজ বপন (১০০টি), চারা গজানো, অসুস্থ চারা, সুস্থ চারা (৮০টি)

(ঘ) ফসল লাগানোতে করণীয়-

বীজ শোধন. দরদ দিয়ে চারা তোলা, ১০ সারির পর ১ সারি শূন্য, নিরাপাদ দুরত্ব বজায় রাখা

(ঙ) জমিতে অথাত বাছাই-

ভিন্ন উচ্চুার গাছ, ভিন্ন রং এর গাছ, ভিন্ন আকৃতিব পাতা, অন্য জাতের গাছ, রোগাক্রান্ত গাছ, রোগাক্রান্ত শীষ, আগাছা, সুস্থ গাছ

(চ) বীজ সংগ্রহ ও শুকানো-

৮০% পাকা অবস্থা, নির্দিষ্ট জায়গার বীজ সংগ্রহ, যত্ন করে আনা, ২১/২ বাড়ির মাড়াই, মাটিতে শুকানো, মাচার উপর শুকানো, খড়ের উপর শুকানো, যন্ত্রের সাহায্যে শুকানো

(ছ) বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা-

দাঁতে কেটে, নখে পিষে, কানে শব্দ শুনে, পায়ে মাড়িয়ে

(জ) বীজ সংরক্ষণ ও ভেষজ ব্যবহার-

পাতিলে তেল মাখিয়ে, মটকায় রং দিয়ে, বোতলে রেখে, বড় লাউয়ের খোল/বশ এ, ড্রামে, ইউক্যালিপটাস পাতা, বিষকাটালী পাতা, ল্যানটেনা পাতা, গোমরা পোকা, কেড়ী পোকা, সুতলী পোকা, লাল পোকা

■ মাঝে মাঝে বীজ রোদে শুকান এবং উল্টে পাল্টে দিন। এতে পূর্ণ ও অপূর্ণ বয়স্ক সব পোকা মারা যায় ও বীজের কাংখিত আর্দ্রতা (১০-১২%) বজায় থাকে।
■ গুদাম বা গোলায় ফাঁটল বা ছিদ্র যেন না থাকে তা খেয়াল করুন।
(ঝ) বাড়ীতে রাখা বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা-

বীজ স্বাস্থ্য = সুস্থ্য বীজ (%) × গজানোর ক্ষমতা (%)/১০০ = ... %
বীজের স্বাস্থ্য ভাল = কমপক্ষে শতকরা ৯৬টি সুস্থ বীজ, কমপক্ষে শতকরা ৮০টি বীজ গজানো

কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার ঃ

পাওয়ার টিলার, নিড়ানী যন্ত্র, গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র, ধান কাটার যন্ত্র, সাধারণ মাড়াই যন্ত্র, উন্নত মাড়াই যন্ত্র, ঝাড়াই যন্ত্র, ধান শুকানো যন্ত্র।

ধান ফসল কাটা ঃ

সাধারণত অক্টোবরের ৩য় সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ।

আমন ধানের আয়-ব্যয়ের হিসাব (৫০ ডিসিমাল জমি) ঃ

(ক) ব্যয়

কাঁচামালের খরচ		= ১,৯৭৫.০০
	মোট	= ১,৯৭৫.০০

(খ) আয়

ধান বিক্রি	১২ মন	= ৬,০০০.০০
খড় বিক্রি		= ১,০০০.০০
	মোট	**= ৭**,০০০.০০

(গ) নীট আয়(খ-ক) = ৫,০২৫.০০

বোরো ধানের আয়-ব্যয়ের হিসাব (৫০ ডিসিমাল জমি) ঃ

(ক) ব্যয়

কাঁচামালের খরচ		= ৮৬৯০.০০
	মোট	**= ৮,৬৯০.০০**

(খ) আয়

ধান বিক্রি	৩০ মন	= ১৮,০০০.০০
খড় বিক্রি		= ২,০০০.০০
	মোট	**=** ২০,০০০.০০

(গ) নীট আয়(খ-ক) = ১১,৩১০০.০০

আখের জাত

ঈশ্বরদী-৩৪

বৈশিষ্ট্যঃ

- খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল
- মধ্যম পরিপক্ক
- রোগবালাই প্রতিরোধক্ষম
- চিনি ধারণ ক্ষমতা মধ্যম ধরণের (১২.৮৩%)
- উচ্চ ফলনশীল (গড় ফলন : ১৩ টন/বিঘা)
- উন্নতমানের গুড় তৈরী হয়
- মুড়ি আখের জন্য অত্যন্ত ভাল
- কদাচিত ফুল হয়

ঈশ্বরদী-৩৭

বৈশিষ্ট্যঃ

- খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল
- আগাম পরিপক্ক
- দ্রত বাড়ে
- বেশী চিনি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (১৪.৪২%)
- উচ্চ ফলনশীল (গড় ফলন : ১৪ টন/বিঘা)
- উন্নতমানের গুড় তৈরীর জন্য উপযুক্ত
- চর অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত

ঈশ্বরদী-৩৮

বৈশিষ্ট্যঃ

- খরা ও জলাবদ্ধতা সহনশীল মাঝারি ধরনের
- আগাম পরিপক্ক
- দ্রত বাড়ে ও কদাচিত ফুল হয়
- বেশী চিনি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (১৪.৬৮%)
- উচ্চ ফলনশীল (গড় ফলন : ১৫ টন/বিঘা)
- উন্নতমানের গুড় তৈরীর জন্য উপযুক্ত
- বন্যা সহনশীল ক্ষমতা খুব বেশী
- লাল পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন

ঈশ্বরদী-৩৯

বৈশিষ্ট্যঃ

- খরা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ক্ষমতা খুব বেশী
- আগাম পরিপক্ক
- বেশী চিনি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (১৪.২%)
- উচ্চ ফলনশীল (গড় ফলন : ১৪ টন/বিঘা)
- উন্নতমানের গুড় তৈরীর জন্য উপযুক্ত
- লাল পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন
- চর অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত
- বন্যা সহনশীল ক্ষমতা খুব বেশী

ঈশ্বরদী-৪০

বৈশিষ্ট্যঃ

- খরা, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ক্ষমতা খুব বেশী
- আগাম পরিপক্ক ও দ্রত বাড়ে
- বেশী চিনি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (১৪.৮৬%)
- উচ্চ ফলনশীল (গড় ফলন : ১৪ টন/বিঘা)
- উন্নতমানের গুড় তৈরীর জন্য উপযুক্ত
- লাল পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন
- চর অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত
- বন্যা সহনশীল ক্ষমতা খুব বেশী

আখ উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

জাত নির্বাচন ঃ

ঈশ্বরদী-৩৪, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৮, ঈশ্বরদী-৩৯, ঈশ্বরদী-৪০

জমি নির্বাচন ঃ

- জমির অবস্থান অবশ্যই উঁচু বা মাঝারি উঁচু হতে হবে;
- জমিটি অবশ্যই সমান হতে হবে। যেখানে বৃষ্টি বা বন্যার পানি দাড়ায় না;
- জমির মাটি এটেল দো-অাঁশ ও দো-আঁশ প্রকৃতির হতে হবে।

জমি তৈরী ঃ

- কেবলমাত্র জো আসলেই জমিতে চাষ দিতে হবে। জো অবস্থায় চাষ করার সময় মাটি লাংগলে লেগে না থেকে ছোট ছোট ঢিলার আকারে দুদিকে সরে যায়;
- আখ চাষাবাদের জন্য জমি চাষের গভীরতা অন্ততঃ ৮ ইঞ্চি হওয়া বাঞ্জনীয়;
- সঠিকভাবে জো আসার পর প্রথম চাষ দেয়া হয়ে থাকলে পরবর্তী চাষগুলো ২/৩ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;
- একটি আদর্শ জমি তৈরীতে ৫/৬টি চাষ ও ২টি মই দিতে হবে;
- জমি তৈরীর সময় ইউরিয়া ২২ কেজি/বিঘা, এমপি ১৮.৫ কেজি/বিঘা, জিপসাম ২০ কেজি/বিঘা, জিংক সালফেট ৫ কেজি/বিঘা প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ নির্বাচন ঃ

- যে জমির আখ থেকে চারা করা হবে সে জমিতে আখ কাটার ৪-৫ সপ্তাহ আগে প্রতি বিঘায় ১৩ কেজি ইউরিয়া দিয়ে কুপিয়ে মাটির সংগে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে যাতে আখগুলো সুস্থ, সবল ও মোটা হয়;

■ সুপারিশকৃত উন্নত জাতের প্রত্যায়িত বীজ ক্ষেত থেকে সুস্থ, সবল এবং রোগ ও পোকামাকড়মুক্ত বীজ নির্বাচন করতে হবে;
■ বীজের জন্য আখের বয়স হতে হবে ৮/৯ মাস;
■ গাছের একেবারে কচি ডগা বাদ দিতে হবে;
■ আখের গোড়ার দিকে ১/৩ অংশ বীজ হিসাবে নির্বাচন করা যাবে না।

বীজ তৈরী ঃ

■ জীবাণুমুক্ত দা/হাসুয়া দিয়ে নির্বাচিত বীজ আখ ক্ষেত থেকে আখ ও আখ বীজ কাটতে হবে (আগুনে তা বা ঝলসিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায়);
■ বীজ আখ কাটার পর এগুলোকে দুরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হলে আখ থেকে শুকনো পাতা না ছাড়িয়েই নিয়ে যেতে হবে এবং তা সতর্কতার সাথে ছাড়াতে হবে যেন আখের চোখ নষ্ট না হয়;
■ পাতা ছাড়ানোর পর বীজ আখকে ছোট ছোট টুকরা করে কাটতে হবে যাতে প্রতিটি টুকরায় ২টি চোখ থাকে।

বীজ শোধন ঃ

প্রস্তুতকৃত বীজখন্ড শোধনের জন্য ব্যাভিষ্টিন বা নোইন নামক ছত্রাকবারক দ্রবণে (ঔষধ ও পানির অনুপাত ১ গ্রামঃ ১ লিঃ) ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ ঃ

বীজখন্ড লাগাতে না পারলে বীজখন্ডগুলো গাদা করে আখের পাতা বা খড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং পাতা বা খড়ের উপর পানি ছিটিয়ে ভেজা রাখতে হবে। এভাবে ৩-৫ দিন বীজ সংরক্ষণ করা যায়। দীর্ঘদিন বীজ সংরক্ষণ করতে হলে কাদা মাটিতে বীজখন্ড ডুবিয়ে রাখতে হবে। এভাবে মাস খানেক বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

রোপণ সময় ঃ

(ক) আগাম রোপণ ঃ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর
(খ) মধ্যম রোপণ ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর
(গ) নাবি রোপণ ঃ ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল

রোপণ দূরত্ব ঃ

সারি থেকে সারি = ১০০ সেঃমিঃ

নালা তৈরী ঃ

নালার গভীরতা হতে হবে ৮ ইঞ্চি

নালায় বীজ স্থাপন পদ্ধতি ঃ

বীজখন্ডগুলোকে নালার মধ্যে একটার পর একটা স্থাপন করতে হবে

নালায় সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

ইউরিয়া ঃ ২২ কেজি/বিঘা, টিএসপি ঃ ৩৭ কেজি/বিঘা, এমপি ঃ ১৮.৫ কেজি/বিঘা

নালায় বীজ রোপণ ঃ

■ বীজখন্ডগুলোকে নালায় এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে চোখগুলো দুই পার্শ্বে থাকে;
■ বীজ স্থাপনের পর ২ ইঞ্চি মাটির আবরণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালিন পরিচর্যা ঃ

(১) গ্যাপ বা শূন্যস্থান পূরন ঃ

■ এ কাজটি করতে হবে চারা রোপণের ২০/২৫ দিন পর;
■ দু ফুট দূরত্বের মধ্যে কোন চারা দেখা না গেলে সেখানে বীজ গজায়নি বলে ধরে নিতে হবে;
■ শূন্যস্থান পূরুণের জন্য তৈরী বীজখন্ডগুলো একত্র করে খড় কিংবা বস্তা দিয়ে ঢেকে মাঝে মাঝে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিলে অল্প কয়েক দিনেই এগুলো গজিয়ে উঠবে এবং তারপর এই গজানো চারা দিয়ে গ্যাপ বা শূণ্যস্থান পূরণ করতে হবে।

(২) মাটি আলগাকরণ ঃ

■ চারা অবস্থায় বা আখের বৃদ্ধিকালীন সময়ে যতবারই ভারী বৃষ্টিপাত হবে অথবা সেচের পর ততবারই মাটি আলগা করে দিতে হবে;
■ মাটি আলগাকরণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ঝুরঝুরা মাটি চারার গোড়ায় পড়ে নালা ভর্তি না হয়।

(৩) আগাছা দমন ঃ

■ এ কাজটি করতে হবে চারা রোপণের পর ৪৫ থেকে ১৩৫ দিন পর্যন্ত;
■ আগাছা দমন দুইটি পদ্ধতিতে করা যায়। পরিচর্যা পদ্ধতিতে প্রতি মাসে একবার আগাছা দমন করতে হবে এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছানাশক (কমান্ড ৪ ইসি ৪০০ মিঃলিঃ/বিঘা) অথবা রনস্টার ২৭০ মিঃলিঃ/বিঘা) ব্যবহার করে আগাছা দমন করতে হবে।

(৪) সারের উপরিপ্রয়োগ ঃ

■ গাছ গজানোর পর জমিতে সার প্রয়োগকে সারের উপরিপ্রয়োগ বলা হয়;
■ ইউরিয়া ও এমপি সারের ১/৩ অংশ রোপণের সময় এবং ২/৩ অংশ ৪ মাস বয়সের মধ্যে উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার ৪ ইঞ্চি মাটির নীচে প্রয়োগ করতে হবে;
■ ঝাড়ের চার পাশে রিং করে বা চক্রাকারে সারগুলো মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

(৫) আখের গোড়ায় মাটি দেয়া ঃ

■ সাধারণতঃ দুবার চারার গোড়ায় মাটি দিতে হবে;

■ কুশি বের হওয়া শেষ হলে (ঝাড় প্রতি ৮-১০ টি কুশি) আর নতুন কুশি হতে না দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে;
■ দ্বিতীয় ও শেষবার মাটি তুলে দিতে হবে প্রথম বারের প্রায় ১ মাস পরে।

(৬) আখ বাঁধা ঃ

■ প্রথমে আখের শুকনো ও অর্ধ শুকনো পাতা দিয়ে প্রতিটি ঝাড় আলাদাভাবে বেঁধে দিতে হবে;
■ পরবর্তীতে পাশাপাশি দুই সারির ৩-৪ টি ঝাড় একত্রে আড়াআবাঁধতে হবে।

সেচ ঃ

■ বীজখন্ড লাগার সময়কালে (জমির মাটি শুকনা হলে) ১ বার সেচ দিতে হবে;
■ কুশি হওয়া থেকে কান্ড লম্বা হওয়া পর্যন্ত সর্ব্বোর্চ ৪টি সেচ দিতে হবে (২১-৩০ দিন পর পর)।

আখ কাটা ঃ

(১) আখ গাছে যখন চিনি বা শর্করার ভাগ সবচেয়ে বেশী হয় তখনই আখ কাটার সময় হয়।
(২) যে ক্ষেত থেকে আখ কাটা হবে সে ক্ষেতের কোন একটি আখকে সমান তিন খন্ডে কেটে চিবিয়ে যদি মনে হয় সব খন্ডই প্রায় সমান মিষ্টি লাগছে তাহলে বুঝতে হবে আখ কাটার উপযুক্ত হয়েছে।
(৩) সাধারণত: ১২-১৪ মাস বয়সের আখ পরিপক্ক হয়ে থাকে।
(৪) কোন সময়ই 'দা' বা 'হাসুয়া' দিয়ে আখ কাটা উচিত না।
(৫) ধারালো কোদাল দিয়ে মাটির সমতলে কিংবা সম্ভব হলে একটু মাটির গভীরেই আখের গোড়া কাটা উচিত।
(৬) আখ কাটার মৌসুম শুরু হয় আশ্বিন (মধ্য সেপ্টেম্বর) থেকে এবং তা (মধ্য এপ্রিল) পর্যন্ত চলে।

আখের আয়-ব্যয়ের হিসাব (১ বিঘা জমিতে) ঃ

ক. ব্যয়-

বীজ-	১০০০ কেজি	১.৮৭	= ১,৮৭০.০০
সার-			
(ক) ইউরিয়া	১৫ কেজি	১২.০০	= ১৮০.০০
(খ) টিএসপি	৩০ কেজি	২২.০০	= ৬৬০.০০
(গ) এমপি	১০ কেজি	২৫.০০	= ২৫০.০০
(ঘ) জিপসাম	২০ কেজি	১১.০০	= ২২০.০০
(ঙ) জিংক সালফেট	১ কেজি	১৮০.০০	= ১৮০.০০
কীটনাশক-			
(ক) ব্যাভিস্টিন	১০০ গ্রাম	১.৮	= ১৮০.০০
(খ) রিজেন্ট ৩জি আর	৩ কেজি	১৫০.০০	= ৪৫০.০০
সার (উপরিপ্রয়োগ)-			

ইউরিয়া	২৫ কেজি	১২.০০	= ৩০০.০০
এমপি	২০ কেজি	২৫.০০	= ৫০০.০০
কীটনাশক (পরবর্তীতে)-			
ফুরাডান ৫জি	১০ কেজি	১২০.০০	= ১,২০০.০০
সেচ-	৩ বার	৯০০.০০	= ২,৭০০.০০
পরিবহন-	থোক হিসাবে	থোক হিসাবে	= ১,৫০০.০০
শ্রমিক-	৩ জন	২৫০.০০	= ৭৫০.০০
বিবিধ-	থোক হিসাবে	থোক হিসাবে	= ৫০০.০০
		সর্বমোট ব্যয়	**= ১১,৪৪০.০০**

খ. ব্যয়-

(১) আখ বিক্রয়-	১৩,২০০ টি	১০.০০	= ১,৩২,০০০.০০
(২) চারা বিক্রয়-	১৩,২০০ টি	১.০০	= ১৩,২০০.০০
(৩) উচ্ছিষ্টাংশ-	থোক হিসাবে	থোক হিসাবে	= ৩,০০০.০০
		সর্বমোট আয়	**= ১,৪৮,২০০.০০**

গ. নীট লাভ-

= (সর্বমোট আয় - সর্বমোট ব্যয়)
= (১,৪৮,২০০.০০ - ১১,৪৪০.০০)
= ১,৩৬,৭৬০.০০

সাথী ফসল

সাথী ফসল কি?

একই সময়ে একই জমিতে দুই বা ততোধিক ফসল পরস্পরের ক্ষতি না করে বরং সম্পূরক হিসেবে আবাদ করাকে সাথী ফসল চাষ বলে।

সাথী ফসল নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়াদি ঃ

- সাথী ফসল অবশ্যই বামনাকৃতি ও খাড়া জাতের হতে হবে;
- সাথী ফসলের জীবনচক্র অবশ্যই চৈত্র - বৈশাখ মাসে সমাপ্ত হতে হবে;
- সাথী ফসলের মূলতন্ত্রের গঠন এরুপ হতে হবে যা আখের নালায় ছড়িয়ে পড়বে না।

আলু, পিঁয়াজ ও রসুন আদর্শ সাথী ফসল কেন?

- আখের ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে;
- এসব ফসল স্বল্প মেয়াদী;

● এগুলোর জন্য ব্যবহৃত সমুদয় সার আহরিত হয় না বিধায় মাটিতে কিছু সার থেকে যায় যা পরবর্তীতে আখের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে;
● এ সমস্ত ফসলের নিবিড় পরিচর্যা কালে আখেরও পরিচর্যা হয়।

সাথী ফসল চাষের সুবিধা ঃ

● একই জমি থেকে একাধিকবার আয় হয়;
● জমির উর্বরতা বাড়ে;
● চাষের খরচ কম হয়;
● অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায়;
● আখের ফলন বাড়ায়;
● আখের আগাছা দমনে সহায়ক হয়;
● রবি ফসলের চাহিদা মিটে;
● প্রাকৃতিক দূর্যোগে আখ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সাথী ফসল আংশিক নিরাপত্তা দিতে পারে।

মুড়ি আখ ঃ

মুড়ি আখের সংজ্ঞা ঃ

পরিপক্ক মুল আখ কাটার পর মাটিতে অবস্থিত আখের কান্ডস্থ চোখ গজানোর পর উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে যে ফসল পাওয়া যায় তাকে মুড়ি ফসল বলে। আর মুড়ি আখের উৎপাদন কলাকৌশলকে মুড়ি আখের চাষ বলা হয়।

মুড়ি আখের সুবিধা ঃ

(১) মুড়ি আখ উৎপাদনে বীজ আখের প্রয়োজন হয় না;
(২) মুড়ি আখ চাষে মুল আখের তুলনায় ২৫-৩০% উৎপাদন ব্যয় কম হয়;
(৩) একক সময়ে একক জমিতে বেশী ফসল উৎপাদিত হয়;
(৪) মুড়ি আখ চাষ অধিক লাভজনক;
(৫) মূল আখের চেয়ে তাড়াতাড়ি পরিপক্ক হয় বলে মুড়ি আখের শস্যকালীন সময় কম লাগে;
(৬) মুল আখ কর্তনের পরে একই স্থানে একাধিকবার মুড়ি আখ চাষ করা যায়;

(৭) সেচের সুবিধা থাকলে মুড়ি আখের সাথে ১-২ টি সাথী ফসলের চাষ করা যায়;

(৮) মুড়ি আখের চাষ সহজ;

(৯) মূল আখ থেকে মুড়ি আখে চিনি আহরণের হার ০.৫-১% বৃদ্ধি পায়;

(১০) মুড়ি চাষের জন্য গ্যাপ পূরুণের প্রয়োজন হয় না।

মুড়ি আখ আবাদে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

(১) আখের জাত মুড়ি আখের উপযোগী হতে হবে;
(২) সারা ক্ষেতে সমভাবে মুড়ি আখের চারা গজাতে হবে;
(৩) ক্ষেতটি পানি নিষ্কাশনের উপযোগী হতে হবে;
(৪) মুল আখ অবশ্যই ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি বা তার আগে কাটতে হবে। কোন অবস্থাতেই তীব্র শীতের মধ্যে আখ কাটা যাবে না;
(৫) রোগ ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম এমন জমিতে মুড়ি আখের চাষ করতে হবে;
(৬) মুড়ি আখ চাষ করা হবে এমন ক্ষেতের আখ অবশ্যই মাটি সমান করে ধারালো কোদাল দিয়ে কাটতে হবে;
(৭) মুল আখ কাটার ১ মাস পূর্বে পলিব্যাগে বিঘা প্রতি ৮৩৩ চারা করে রাখতে হবে যাতে করে আখ কাটার ১৫ দিনের মধ্যেই ফাঁকা জায়গা দেখা গেলে তা পূরণ করা যায়;
(৮) মুল আখ কর্তনের পরপরই মোথাগুলি ভালোভাবে ছেটে দিতে হবে;
(৯) বিঘায় ২ টন গোবর সার অথবা ৬১ কেজি খৈল ব্যবহার করতে হবে;
(১০) মুড়ি আখ চাষের জন্য সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে রোপা পদ্ধতিতে মুল আখ চাষ করতে হবে;
(১১) মুল আখের চেয়ে বিঘা প্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া বেশী প্রয়োগ করতে হবে।

মুড়ি আখ চাষের জন্য ক্ষেত নির্বাচন ঃ

(১) রোগ ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম এমন জমি মুড়ি আখের জন্য নির্বাচন করতে হবে;
(২) যে জমিতে এক মাসের বেশী বৃষ্টির বা বন্যার পানি দাঁড়ায় না;
(৩) অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের সুব্যবস্থা আছে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে;
(৪) রোগাক্রান্ড় ও গ্যাপযুক্ত জমিতে মুড়ি আখ চাষ করা যাবে না।

মুড়ি আখ চাষের জন্য জাত নির্বাচন ঃ

বাংলাদেশে মুড়ি আখ চাষের জন্য উত্তম জাত হিসাবে ঈশ্বরদী ২/৫৪, ঈশ্বরদী ১৮, ঈশ্বরদী ২০, ঈশ্বরদী ২২, ঈশ্বরদী ২৭, ঈশ্বরদী ২৮, ঈশ্বরদী ২৯, ঈশ্বরদী ৩০, ঈশ্বরদী ৩১, ঈশ্বরদী ৩২, ঈশ্বরদী ৩৩, ঈশ্বরদী ৩৪, ঈশ্বরদী ৩৫, ঈশ্বরদী ৩৬, ঈশ্বরদী ৩৭ ও ঈশ্বরদী ৩৮ প্রভৃতি উলে- খযোগ্য।

মুড়ি আখ চাষের জন্য উপযুক্ত সময় ঃ

আগাম মুড়ি আখের চাষ করার জন্য মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ড় মূল আখ কাটা উত্তম। তবে ফের"য়ারী-মার্চ মাসে মূল আখ কেটেও মুড়ির আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

মুড়ি আখ চাষের নিয়ম ঃ

মূল আখ কাটার এক সপ্তাহের মধ্যে লাঙ্গল দিয়ে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করতে হবে। ক্ষেতে বিদ্যমান শুকনো পাতা এবং পরিত্যক্ত অংশ পুরিয়ে ফেলতে হবে। আখের মোথা (ংঁননষব) মাটির সমতলে কেটে দিতে হবে। তবে মূল আখ কোদাল দিয়ে মাটির সমতলের ৪-৫ সে.মি. নিচে কর্তন করলে মোথা কাটার প্রয়োজন নাই। জমিতে রসের অভাব থাকলে একটি সেচ দিতে হবে যাতে করে অধিক সংখ্যক কুশি গজায়।

মুড়ি আখ চাষের জন্য সারের পরিমান ঃ

ক্রমিক নং	সারের নাম	পরিমান
১	খৈল	৬১ কেজি/বিঘা
২	ইউরিয়া	৫৩ কেজি/বিঘা
৩	টি.এস.পি.	৪২ কেজি/বিঘা
৪	এম.পি.	২৪ কেজি/বিঘা
৫	জিপসাম	৩০ কেজি/বিঘা
৬	জিংক সালফেট	২ কেজি/বিঘা

প্রয়োগ পদ্ধতি-

(১) জমি চাষের সময় খৈল, অর্ধেক ইউরিয়া, অর্ধেক এম.পি., টি.এস.পি., জিপসাম এবং জিংক সালফেট সারের পুরোটাই মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

(২) অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এম.পি.সার কুশি বের হওয়ার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে্।

মুড়ি আখের পরিচর্যা ঃ

- মূল আখের মোথা কর্তনের পরপরই একটি প-াবন সেচ প্রয়োগ করতে হবে।
- পরিমিত মাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।
- আখ ক্ষেতে পূর্ণ গোছা উৎপাদিত না হওয়া পর্যন্ড় ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- ঝাড় প্রতি ১২-১৫ টি কুশি উৎপন্ন হলেই ঝাড়ের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।
- আখের গাছ যাতে হেলে না পড়ে সেজন্য প্রথমে প্রতিটি ঝাড় আলাদা আলাদা ভাবে বেঁধে পরে ২-৩টি করে ঝাড় একত্রে আড়াআড়িভাবে বেঁধে দিতে হবে।

মুড়ি আখ কর্তন ও ফসল সংগ্রহ ঃ

আশ্বিন মাস থেকে আখ কাটার মৌসুম শুর" হয় এবং তা ফাল্গুন–চৈত্র মাস পর্যন্ড় অব্যাহত থাকে। তবে মূল আখের চেয়ে মুড়ি আখ কিছুটা তাড়াতাড়ি পরিপক্কতা লাভ করে। ধারালো কোদাল দিয়ে মাটির সমতলে কিংবা সম্ভব

হলে একটু মাটির গভীরেই আখের গোড়া কাটতে হবে। আখ কর্তনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রস সংগ্রহ করে চিনি বা গুড় উৎপাদন করতে হবে।

আখের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও তার দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

ডগার মাজরা পোকা

(১) ডগার মাজরা পোকার মথ ও ডিমের গাদা সংগ্রহ ও ধ্বংস করা ঃ
হাত দিয়ে ডগার মাজরা পোকার মথ ও হাত বা হাসুয়ার সাহায্যে সামান্য পাতাসহ ডিমের গাদা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে(জানুয়ারী-জুন)
(২) ডগার মাজরা পোকার যান্ত্রিক দমন(কীড়া/পুত্তলী) ঃ
পোকা আক্রান্ত গাছ গোড়ার কাছ থেকে কেটে পোকাসহ ধ্বংস করতে হবে(জানুয়ারী-জুন)

(৩) কীটনাশকের সাহায্যে ডগার মাজরা পোকা দমন ঃ
আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালার মধ্যে দানাদার কীটনাশক ফুরাডান ৫ জি/ কুরাটার ৫ জি/ সানফুরান ৫ জি/ কৃষাণ ৫ জি বিঘা প্রতি ৫ কেজি অথবা মার্শাল ৬ জি বিঘা প্রতি ৪ কেজি নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা থাকা বাঞ্জনীয়(মার্চ, মে)

কান্ডের মাজরা পোকা

(১) কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য পোকামুক্ত বীজ রোপন ঃ
আখ রোপনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে বীজখন্ডটি যেন পোকামুক্ত হয় (রোপনকাল)
(২) কান্ডের মাজরা পোকা দমনে গাছ থেকে শুকনো পাতা ছাড়ানো ঃ
বয়স্ক আখ গাছ থেকে পুরানো এবং শুকনো পাতা গুলো ছাড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে যাতে কান্ডের মাজরা পোকার ডিমের গাদাগুলো নষ্ট হয়ে যায় (আগষ্ট-অক্টোবর)
(৩) কান্ডের মাজরা পোকার যান্ত্রিক দমন (কীড়া/পুত্তলি) ঃ
প্রাথমিক আক্রান্ড় গাছ গুলো আক্রান্ড় স্থানের নীচ থেকে পোকাসহ কেটে ধ্বংস করে ফেলতে হবে (মে-আগষ্ট)
(৪) কীটনাশকের সাহায্যে কান্ডের মাজরা পোকা দমন ঃ
বিঘা প্রতি ১০ কেজি পাদান ৪জি/ সিডান ৪জি আখের সারির উভয় পাশে নালা কেটে নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে দানাগুলো ঢেকে দিতে হবে(জুন - আগষ্ট)
(৫) ট্রাইকোগ্রামা ডিম্ব পরজীবি দ্বারা কান্ডের মাজরা পোকা দমন ঃ
মে মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে আগষ্ট মাসের ৪র্থ সপ্তাহ পর্যন্ড় হেক্টর প্রতি ৬,৭৪৮ সদ্য প্রসূত ট্রাইকোগ্রামা (ঋৎবংযষু বসধৎমবফ) আখ ক্ষেতে অবমুক্ত করতে হবে। ক্ষেতের যে কোন এক কোণায় ১ মিটার ভিতরে প্রবেশ করে টেষ্টটিউবের মুখ খুলে চতুস্কোণ হিসাবে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশঃ মাঝখানে ছাড়া শেষ করতে হবে। (মে- আগষ্ট)

গোড়ার মাজরা পোকা

(১) গোড়ার মাজরা পোকা দমনের জন্য কর্তনের পর মোথা (ঝঃঁননষব) পোড়ানো ঃ

পোকা প্রবন অঞ্চলে আখ কর্তনের পর মোথাগুলো উপড়িয়ে মাঠেই দুই/চার দিন শুকানোর পর পোকাসহ (কীড়া/পুত্তলি) পুড়িয়ে ধ্বংস করতে হবে (কর্তনের পর)

(২) গোড়ার মাজরা পোকার যান্ত্রিক দমন ঃ
গোড়ার মাজরা আক্রান্ড় গাছগুলো কে হাসুয়া/কোদাল দিয়ে উঠিয়ে পোকাসহ ধ্বংস করে ফেলতে হবে(ফেব্রুয়ারী-জুন)
(৩) কীটনাশকের সাহায্যে গোড়ার মাজরা পোকা দমন ঃ
লরসবান ১৫ জি বিঘা প্রতি ২ কেজি অথবা রাগবি ১০জি বিঘা প্রতি ৩ কেজি আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে গাছের গোড়ায় ও নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটিতে জোঁ থাকতে হবে(মার্চ, মে, জুলাই)

আগাম মাজরা পোকা
(১) আগাম মাজরা পোকার যান্ত্রিক দমন (কীড়া/পুত্তলি) ঃ
আগাম মাজরা পোকা আক্রান্ড় গাছগুলো মাটির নীচ থেকে পোকাসহ কেটে ধ্বংস করতে হবে(জানুয়ারী-মে)

(২) কীটনাশক দ্বারা আগাম মাজরা পোকা দমন ঃ
ফুরাডান ৫জি/কুরাটার ৫জি/কৃষান ৫জি বিঘা প্রতি ৫ কেজি অথবা মার্শাল ৬জি বিঘা প্রতি ৪ কেজি ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা থাকা বাঞ্ছনীয়(রোপন/ফেব্রুয়ারী)
অথবা লরসবান ১৫ জি বিঘা প্রতি ২ কেজি আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালার মধ্যে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা থাকা বাঞ্ছনীয় (ফেব্রুয়ারী)
অথবা রিজেন্ট ৩ জিআর বিঘা প্রতি ৪ কেজি অথবা রিজেন্ট ৫০ এসসি বিঘা প্রতি ০.৫ লিটার নালায় আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালার মধ্যে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা থাকা বাঞ্ছনীয়(রোপন, ফেব্রুয়ারী)